তসলিমার চ্যালেঞ্জাররা ও আমি

শুধু দেখতে হবে ইসলামের সুদৃঢ় প্রাচীরে তিনি আঁচড় কেটেছেন কি না! যদি কাটেন তবে তিনি ধর্মদ্রোহী, ইসলাম বিরোধী। বেশ কড়া শাস্তিই তাঁর প্রাপ্য। মুখের ভাষা কখনও কোথাও অন্যরকম হলেও এটাই মুসলিম মানসের মনের কথা। বলেছেন মনিরুল হক

তাঁর কোনো এক্তিয়ার নেই, অধিকার নেই। যে অধিকার তাঁকে দেওয়াই হয়নি সে অধিকারের সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন কীভাবে? আর সেই মনগড়া সুযোগ গ্রহণ করে এমনতর কথাবার্তা তিনি বলেন কীভাবে যাতে ধর্মীয় নিয়মনীতি লঙ্ঘনের উস্কানি দেওয়া হয়, ধর্মকে হেয় করা হয়, ধর্মের (বিশেষত ইসলামের) যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়? আসলে তিনিও সীমা লঙ্ঘনকারী। তিনি তসলিমা। সামগ্রিকভাবে তাঁর লেখা পড়ে দেখার দরকার নেই। তিনি যে সমস্যার কথা বলেছেন তা আমারও সমস্যা কিনা তা বোঝার দরকার নেই। পিছিয়ে থাকা ব্যক্তির ও সমাজের (বিশেষত মুসলিম) বিকাশ ও উন্নতির ক্ষেত্রে তাঁর মতবাদ সাহায্য করবে কিনা তা জানারও দরকার নেই। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বা যুক্তির বিচারে তিনি সঠিক অবস্থান গ্রহণ করেছেন কি না তা কেন বিবেচ্য হবে? শুধু দেখতে হবে ইসলামের সুদৃঢ় প্রাচীরে তিনি আঁচড় কেটেছেন কি না! যদি কাটেন তবে তিনি ধর্মদ্রোহী, ইসলাম বিরোধী। বেশ কড়া শাস্তিই তাঁর প্রাপ্য। মুখের ভাষা কখনও কোথাও অন্যরকম হলেও এটাই মুসলিম মানসের মনের কথা।

তসলিমা নিজেকে লেখক বলতে ভালোবাসেন। তাঁর লেখায় থাকে আত্ম জিজ্ঞাসা, সমাজ জিজ্ঞাসা। বারবার তিনি চেয়েছেন সমমর্যাদা—নারী নয়, মানুষ হিসাবে পরিচয়ের অধিকার। সে অধিকারের অনুসন্ধান তিনি করেছেন নিজের মতো করে। প্রথমে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র—সর্বত্র তিনি লক্ষ্য করেছেন নারীকে অবদমিত করার অন্তহীন প্রচেষ্টা। মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের নারী হৃদয়ের ব্যথা, বেদনা, আকুতির সঙ্গে তার অজ্ঞতা, অসচেতনতা তাঁকে গভীরভাবে পীড়া দেয়। তাঁকে বিরক্ত করে, তাঁকে বিদ্রোহী করে তোলে।

এ পর্যন্ত তো ঠিকই ছিল। এ আমাদের চেনা কথা, জানা পথ। কিন্তু তসলিমার গল্পের নটেগাছটি এখানে মুড়োয় না। তিনি নিজের ও পরিচিত জনের জীবনযাপন লক্ষ্য করে বুঝেছেন নারীর অবমাননা আর অসহায়তায় পুরুষতন্ত্রের ভূমিকা ব্যাপক আর এই ব্যাপকতা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠায় ধর্মের (এদেশে ইসলামের) জোরালো ভূমিকা আছে। আর এভাবেই তাঁর লেখায় চলে আসে ধর্মের কথা। তিনি নিজে যে ধর্মের মানুষ, তাঁর পরিবারের লোকজন যে ধর্মের মানুষ, যে ধর্মকে তিনি অনেক বেশি জানেন, অনেক বেশি বোঝেন সে ধর্ম ইসলাম ধর্ম। বিভিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যায় *কোরান* ও *হাদিসের* মত ধর্মগ্রন্থগুলির অবস্থান ও ব্যাখ্যা তাঁর কাছে প্রায়শই অপ্রয়োজনীয়, নীতিহীন এবং কখনও কখনও অন্যায় বা অন্যায়কারীর পক্ষে কাজ করেছে বলে মনে হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে অকপটে তিনি তা প্রকাশ করেছেন। মানুষ হিসেবে অধিকার অর্জন ও রক্ষায় যে সব ধর্মীয় বিধান তাঁকে হতাশ করেছে। যে সব বিধানের বিরুদ্ধে তিনি মুখ খুলেছেন, সে সব বিধানের তিনি পরিবর্তন চেয়েছেন, অবলুপ্তি চেয়েছেন। হোক সে জবরদস্ত ইসলামী আইন, হোক সে *কোরানের* বিধান।

শালীনতার কথাই ধরা যাক। ইসলামে নারী পুরুষ সবাইকে শালীনতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। পুরুষদের শালীন পোষাক সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা না হলেও নারীদের পোষাক সম্পর্কে পরিস্কার বিধান দেওয়া আছে। আচ্ছা আমরা তো ঘরে বাইরে সবসময় বাঙালি মুসলিম মহিলাদের দেখি। তাঁরা তো শাড়ি পড়েন। তাঁরা তো যথেষ্ট শালীন থাকেন। কিন্তু এই বাংলায় মৌলবী, মওলানা ও অন্যান্য ইসলামি ধর্মবেত্তা এবং কিছু সাধারণ বাড়ির মহিলাদের দেখি শালীনতা রক্ষার জন্য

কেন এই নির্বাসন দণ্ড?

তসলিমা নাসরিন

"নিজেকে জিজ্ঞেস করছি, কী অপরাধ আমি করেছি? কেন আজ আমি এখানে, যেখানে আমি। এ কী রকম জীবন আমার? আমি চৌকাঠ ডিঙোতে পারব না, এবং কেউই আমার নাগাল পাবে না! কী অপরাধ আমি করেছি যে আমাকে লোকচক্ষুর আড়ালে জীবন কাটাতে হচ্ছে, থাকতে হচ্ছে অন্তরীণ। কী অপরাধের শাস্তি আমাকে দিচ্ছে এই সমাজ, এই দেশ, এই জগৎ। নিজের মনের কথা লিখেছিলাম, নিজের বিশ্বাসের কথা লিখেছিলাম কাগজে। কাগজেই লিখেছিলাম, কারও গায়ে পাথর ছুঁড়ে কিছু বলিনি, কারও মুণ্ডু কেটেও কিছু কোনওদিন লিখিনি। কিন্তু তারপরও আমি অপরাধী। আমার নিজের মত অনেকের মতের চেয়ে ভিন্ন ছিল বলে আমাকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। একটা যুগ ছিল, রাজার অবাধ্য হলে শূলে চড়ানো হত। দেশসুদ্ধ লোক দেখতো শূলে চড়া মানুষটির কষ্ট। আমাকেও তো অনেকটা নতুন যুগের শূলে চড়ানো হল। দেশসুদ্ধ লোক কি দেখছেনা আমার যন্ত্রণা? দেখছে না কী ভয়াবহ যন্ত্রণা হলে, নিজের ভেতর নিজের মৃত্যু কতটা হলে, আশাভঙ্গ আর হতাশা কতটা চরম হলে, কতটা ভয়ংকর হলে নিজের বিশ্বাসের কথা মানুষ ফিরিয়ে নেয়, নিতে পারে! কতটা অপমানিত হলে, কতটা ত্রাত্য হলে, কতটা পিষ্ট হলে, কতটা রক্তাক্ত হলে আমি বলতে পেরেছি, আমার ওই বাক্যগুলো তোমরা বাদ দিয়ে দাও, বাদ দিয়ে যদি তোমাদের আরাম হয় হোক, বাদ না দিলে তোমরা কেউই আমাকে বাঁচতে দেবে না জানি, তোমাদের রাজনীতি, তোমাদের ধর্ম, তোমাদের হিংস্রতা, তোমাদের বীভৎসতা নারকীয় উল্লাসে আমার রক্ত পান করবে, করতেই থাকবে যতক্ষণ না শেষ বিন্দু রক্ত আমার শেষ হয়। উড়িয়ে দাও ওই নিষিদ্ধশব্দগুলো, উড়িয়ে দাও থোকা থোকা সত্য। শব্দ তো নিতান্তই নিরীহ। সত্য তো নিরস্ত্র। মসি চিরকালই হেরে গেছে অসির কাছে। চারদিকে অসির আস্ফালন। আমার মতো সামান্য মানুষ তাবড় তাবড় শক্তির বিরুদ্ধেকী করে পেরে উঠবে! আমি তো অসত্য জানি না।" *২১ ডিসেম্বর '০৭-এর দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান থেকে পুনর্মুদ্রিত।*

সেই শাড়ির উপর আস্ত একটা বস্তা উল্টো করে পরিয়ে দিলে তবেই তাঁদের শালীনতা রক্ষা হয়, নচেৎ নয়। এইসব দেখে, 'ইসলামে নারীর অধিকার সুরক্ষিত' — এই মতের সমর্থক লেখিকা সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তাফা পর্যন্ত বলেন — ***এখানে বোরখা কোনো আব্রু রক্ষা করেনা এবং হাসির খোরাক যোগানের মত দৃষ্টি আকর্ষণ করে।*** কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়। এই অবস্থা বিশ্লেষণ করে তসলিমা দেখান যে এভাবে জীবনযাপনের জন্য মহিলারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাঁদের শারীরিক অসুবিধা ও মানসিক বিকার ঘটছে। ফলে তাঁদের সার্বিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আর এর মূল কারণ হচ্ছে ইসলামের অনুশাসন, নারীর প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী। স্বভাবতই তিনি এই ইসলামি অনুশাসনের বিরোধিতা করেছেন।

বাস্তব জীবনের শুরু তো বিবাহ থেকে। ইসলামের প্রথম যুগে কারও কারও ক্ষেত্রে বিবাহের সংখ্যা প্রয়োজন বা আভিজাত্য বা ফ্যাশনের নিরিখে ঠিকই মানিয়ে যেত। ৪৫ বছর বয়সেই খলিফা আলির পুত্র আল-হাসানের বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১০০-র মত। এর জন্য তিনি মহান 'বিবাহ-বিচ্ছেদকারী' আখ্যা পেয়েছিলেন। সে জন্যই হয়ত ইসলামি আইনে বেশ কড়াভাবে বিবাহের সংখ্যা (মানে পুরুষের ক্ষেত্রে) চার-এ সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আজকের বাস্তব জীবনে তো আর সেই ১৪০০ বছর আগের ইসলামি আরব জীবন নয়। কালের নিরিখে, সভ্যতার অগ্রগতিতে, সামাজিক শিক্ষায়, পারিবারিক ব্যাপ্তিতে মুসলিম পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রীর কথা কল্পনাই করে না, তৃতীয় চতুর্থ তো বহু দূরে। এভাবেই চার স্ত্রী রাখার ইসলামি সংস্কৃতি, ইসলামি আইন অপ্রয়োজনীয়, হাস্যকর হয়ে উঠছে।

আসলে ইসলামের আবির্ভাবের সময় আরবদেশে পুরুষরা মহিলাদের যে চোখে দেখত তা ছিল অতীব নিন্দনীয়। সেই ধারা অনেকটা কাটিয়ে উঠলেও কোরানেও নারীকে শস্যক্ষেত্র, ভোগ্য এ সব বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। বেহেশতের সুখী জীবনে অনাঘ্রাতা সুন্দরী তরুণীদের বর্ণময় উপস্থিতির টোপ ইহজগতের পুরুষ মুসলিমদের দিয়ে রাখা হয়েছে।

মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন আসলে যথেচ্ছভাবে বিচ্ছেদ ঘটাবার অধিকার দিয়েছে পুরুষকে। এটা এতটা হতাশাজনক যে ভারতীয় মুসলিম ল বোর্ডের বোরখা পরা মহিলা সদস্যও সে আইনের পরিবর্তন চেয়েছিলেন। কিন্তু হল না, হয় না, হবে না। পরিবর্তন করা যাবে না। মুসলিম সামাজিক আইন তৈরি হয়েছে কোরানের বিধান মেনে। আর কোরানের সৃষ্টি তো কোনো মানুষ করেনি। করেছেন পরম করুণাময় আল্লাহ্। সে আইন বলবৎ থাকবে মানব সভ্যতার শেষ পর্যন্ত। তবে পরিবর্তন বা পরিমার্জনের সুযোগ না থাকলেও, কোরানের বিভিন্ন বাক্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যার সুযোগ ছিল। বর্তমানে সে সুযোগ অন্তর্হিত। সব ব্যাখ্যা শেষ। তার মধ্যে ঠিক সময়ে ছোট কথাগুলো আমরা ভুলে যাই, দেখি না। পণ্ডিতরাও দেখেন না, দেখলেও ব্যাখা করেন না, ব্যাখ্যা করলেও দক্ষিণী মতে (দু'দিকে মাথা হেলিয়ে)। যেমন— "তালাকপ্রাপ্ত নারীদিগের প্রথামত ভরণপোষণ করা সাবধানীদের কর্তব্য"।

ব্যাখ্যা (***সাবধানী*** শব্দের) —

(১) তালাকদাতা স্বামীকে বোঝানো হয়, এমন ধারণা আদৌ সংগত নয়।

(২) স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে বোঝানো হয়, এ ধারণাও ঠিক নয়।

নিজেকে চিমটি কেটে দেখলাম ঠিক আছি! আপনিও হয়ত ঠিক আছেন। কিন্তু কোথায় যাবেন থুড়থুড়ি বুড়ি শাহবানু?

উত্তর নেই। উত্তর চাওয়ার অধিকার নেই। অধিকার নেই কোনো ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা চাওয়ার। অধিকার নেই কোনো ঘটনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনার। এ কথা তো সবার জানা যে হিজরতের এক বছর আগে রহব মাসের ২৭ তারিখে তাঁর নিদর্শন সমূহ দেখানোর জন্য পরম করুণাময় তাঁর রসুলকে সপ্তম স্বর্গ ভ্রমণ করিয়েছিলেন। এ নিয়ে ঠাট্টা করছি না। রক্ত মাংসের মানুষ হজরত মহম্মদ কেমন করে কোন যানে কোথায় ভ্রমণ করে এসেছিলেন তার লৌকিক ব্যাখ্যা দাবি করা কি অন্যায় হবে? ঠাট্টা বরং তিনি করেছেন মানুষের জ্ঞানগম্যি নিয়ে। সুযোগ নিয়েছেন মানুষের বিশ্বাসের। না, এই ব্যাখ্যা দাবি করা অন্যায় হবে না, অযৌক্তিক হবে না, অবৈজ্ঞানিক হবে না, অমানবিকও হবে না, কিন্তু হবে অধার্মিক, অনৈস্লামিক। আর এখানেই সুযোগ হারাবেন তসলিমা, তসলিমারা।

মানব কল্যাণে ভগবান যুগে যুগে দূত পাঠিয়েছেন কিন্তু তিনি একসময় ঘোষণা করলেন — এই শেষ, মহম্মদ তাঁর শেষতম দূত, তিনি আর কোন দূত পাঠাবেন না। অন্যান্য দূতদের মত হজরত মহম্মদও জাগতিক উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন কিন্তু বাস্তবে তিনি যা বলে গেছেন, তিনি যা করে গেছেন সেটাই শেষ কথা। তারপর আর কোনও কথা বলার অধিকার নেই। সব কথাই বলতে হবে তাঁর সুরে, তাঁর ভঙ্গিতে, তাঁর বয়ানে। সাহিত্য হোক, বিজ্ঞান হোক, দর্শন হোক, না-গান হোক, খেলাধূলা হোক — সবেরই উৎস আর বিকাশ লুকিয়ে আছে তাঁর জীবনে, তাঁর কথনে। এটাই ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য, মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তাই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, বহুত্ববাদের বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের প্রচার করতে গিয়ে হজরত মহম্মদ যে ধর্মমত প্রচার করে গেছেন মানবকল্যাণের মোড়কে তা এক নির্ভেজাল মৌলবাদ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চেয়ে প্রত্যাদেশের মূল্য যেখানে অনেক বেশি। বিশ্বাসের বেদিতে যেখানে জলাঞ্জলি যায় বুদ্ধির মুক্তি। ধর্মগ্রন্থের পাতায় আটকে মরে বিবেকের যুক্তি। এটাই এ সময়ের ইসলাম।

এই প্রেক্ষিতে যদি দেখি তাহলে সহজেই বুঝতে পারব মুসলিম জনমানস কেন তসলিমাকে সমর্থন করতে পারে না। আর এক্ষেত্রে ভালো-মন্দ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রক্ষণশীল-আধুনিক এমনকি নারী-পুরুষ ভেদও বিলীন হয়ে যায়। তসলিমাকে সামান্য সমর্থন করতে গেলে নিজেকে ভালোবাসতে হবে, সমাজকে ভালোবাসতে হবে।

কিন্তু সেটাই তো আসল কথা নয়। জীবনভোর যেটা করে যেতে হবে তা হল আল্লাকে ভালোবাসা, আল্লাকে শ্রদ্ধা জানানো। সেই আল্লাহ্র প্রেরিত বাণীকে যিনি অপ্রয়োজনীয় মনে করেন তিনি তো আল্লাহ্কেই চ্যালেঞ্জ করেন!। আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মুসলমানরা আর যাই করুন সেই চ্যালেঞ্জারকে সমর্থন করতে পারেন না, দেখাতে পারেন না সামান্য অনুকম্পাও। বরং নিজের জীবন, ধন, মান সবকিছু বাজি রেখে লড়ে যেতে হবে আল্লাহ্র পক্ষে, ধর্মের পক্ষে, ইসলামের পক্ষে। এটাই ধর্মপ্রাণ মুসলমানের শিক্ষা, কর্তব্য। এই শিক্ষা ও কর্তব্য সম্পর্কে একটু কম সচেতন হলেই ফিরে আসবে নিজের প্রতি ভালোবাসা, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ। নিজের সাথে কথা বলে এভাবে কি আল্লাহ্র প্রতি ভক্তি একটু কমিয়ে সেটাকে নিজের ট্যাঁকে জমা রাখবেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা? না হলে কোন সুযোগ নেই। সুযোগ তাঁদেরই দরকার। অধিকার তাঁদেরই দরকার — ভাববার, জানবার, বোঝবার। তসলিমা সেই সুযোগ করে দিয়েছেন।